নীলকণ্ঠী
কাজী মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

সামাজিক-ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ/গ্রন্থ
(Socio-Historical Essay/Research Writing)।

Chena Sur
PROKASHONI

নীলকণ্ঠী

কাজী মুহাম্মদ খলিলুর রহমান।

গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক
প্রথম সংস্করণ
১৮ পৌষ ১৪৩২/১লা জানুয়ারী ২০২৬ ইং
প্রকাশনায়ঃ চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়ঃ জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা ময়মনসিংহ।
শাখা অফিসঃ ২৮/১ রুপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৯১১৫১৬৯২
প্রকাশকঃ এন, আই, বিপুল।
সম্পাদনায়ঃ এন, আই, বিপুল।
প্রচ্ছদঃ জহির।
পরিবেশকঃ সাগরিকা প্রকাশনী, প্রহেলিকা প্রকাশনী
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি ডট কম
মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স
২৮/১, রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য ৩০০ টাকা
ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-২৯১৪১-৩-৩

"**Neelkonthy**" by **Kazi Muhammad Khalilur Rahaman**
Published by N I Bipul. Chena sur prokashoni. Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: 28/1 Rupchand lean, Banglabazar Dhaka.
To purchase online www.rokomari.com chenasurprokasoni@gmail.com
ISBN: 978-984-29141-3-3
Price 300 Taka
(For Adult Readers - 18+)

সতর্কীকরণ: এই গ্রন্থটি পতিতাবৃত্তির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত দিক নিয়ে একটি গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এর বিষয়বস্তু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সংবেদনশীল এবং কিছু বর্ণনা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। **পাঠক স্ববিবেচনায় বইটি গ্রহণ করুন।**

উৎসর্গঃ

এই সমাজের অলিখিত ইতিহাসে, যাদের জীবনগাঁথা চাপা পড়ে আছে অবহেলা আর অপমানে।

যারা লোকচক্ষুর আড়ালে নীরবে বিষের জ্বালা সয়ে যান, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারেন না—সেই সমস্ত 'নীলকণ্ঠী' মা ও বোনেদের প্রতি।

যাদের হাসি, কান্না, সংগ্রাম এবং মানবিক মর্যাদার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা এই গবেষণার মূল অনুপ্রেরণা, তাদের সশ্রদ্ধ চিত্তে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত।

লেখকের কথা

সমাজকে আমরা সভ্যতার কাঠামোয় যতই মুড়ে রাখি না কেন, এর অভ্যন্তরে কিছু অন্ধকার অধ্যায় দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছায় চোখ বন্ধ করে থাকি। পতিতাবৃত্তি তেমনই এক গভীর ক্ষত, যা মানব সভ্যতার শুরু থেকে বহমান হলেও, কোনো সমাজই তাকে সম্মানজনক স্বীকৃতি না দিয়ে শুধু আড়াল করে রাখার ভান করেছে। 'নীলকণ্ঠী' আমার সেই অন্ধকারের দিকে আলো ফেলার এক নিবেদন।

এই বইটি লিখতে গিয়ে আমি নিছক তথ্য সংগ্রহ করিনি, আমি গভীর এক নীরব আর্তনাদ শুনেছি। আমি দেখেছি রুপা, জবা-এর মতো নারীদের হৃদয়বিদারক জীবন—কীভাবে নারীত্বের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, প্রতারিত হয়ে, কিংবা সমাজের কাঠিন্যের শিকার হয়ে তারা এই নিষিদ্ধ জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত আখ্যানগুলি আমাকে শিখিয়েছে যে, এটি কেবল একটি পেশা নয়, বরং সামাজিক বঞ্চনা, অসহায়ত্ব এবং পুরুষের লালসার এক সম্মিলিত ফল। এই নারীদের করুণ জীবন আমাকে বাধ্য করেছে কলম ধরতে, কারণ মানবিক সংযোগ ছাড়া এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

আমার কাজ কেবল বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমি ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে। প্রাচীন ব্যাবিলনের দেবদাসী প্রথা থেকে শুরু করে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', ইউরোপের মধ্যযুগ এবং আধুনিক বাংলাদেশের আইনি ও সামাজিক বিশ্লেষণ আমাকে এটাই প্রমাণ করেছে যে, এটি নিছক ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, বরং এটি একটি সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ পাঠকের সামনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব তুলে ধরবে বলেই আমার বিশ্বাস।

'নীলকণ্ঠী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমি পাঠকের সামনে একটি আয়না তুলে ধরতে চেয়েছি। এই আয়না আমাদের সমাজের দ্বিচারিতা, নৈতিক ভণ্ডামি এবং মানবিক বঞ্চনার দিকটি দেখাবে। আমি আশা করি, এই গ্রন্থ নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের প্রতি ঘৃণা নয়, বরং গভীর সহমর্মিতা ও সমাধানের পথ খুঁজতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে। এই নীরব আর্তনাদকে আর কতদিন আমরা উপেক্ষা করব?

এই গ্রন্থটি যদি সমাজের বিবেককে সামান্যতম নাড়া দেয় এবং সমাধানের পথে এক কদমও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

কাজী মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

※সূচিপত্র※

- ❖ অন্ধকারে জ্বলে ওঠা জোনাকিরা ৭
- ❖ রুপা ও জবার কাহিনী ৯
- ❖ এবার ইতিহাসের পালা ১১
- ❖ গণিকাবৃত্তি আদিম ইতিহাস ১৫
- ❖ পুরাণের অপ্সরা থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চ ২১
- ❖ গনিকা বিতর্ক ও আধুনিক প্রেক্ষিত ২৮
- ❖ উপনিবেশের ফলে গণিকা ৩১
- ❖ পর্নো ছবির গণিকা ৩১
- ❖ শিল্পের ক্যানভাসে গণিকা ৩২
- ❖ মডেল, দেবদাসী ও আধুনিক গণিকা ৩৩
- ❖ দেবদাসী প্রথায় গণিকা.....৩৩
- ❖ আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গণিকা.....৩৬
- ❖ মধুচক্র.....৩৭
- ❖ যৌন-পর্যটন বা সেক্স ট্যুরিজম.....৩৯
- ❖ বিশ্বজুড়ে গণিকা বৃত্তি.....৪১
- ❖ শেষ পরিণতি.....৪৭
- ❖ বাংলাদেশের যৌনপল্লী.....৪৮
- ❖ ইতিহাস ৪৯
- ❖ জেলাভিত্তিক যৌনপল্লী ৫৪
- ❖ জবার প্রস্থান ও নীরবতার ভার.....৫৭
- ❖ ইসলামে "যিনা" সংজ্ঞা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা.....৫৮
- ❖ ইসলামের যৌনতা.....৬১
- ❖ যৌন শিক্ষা (শিশু).....৬২
- ❖ খাৎনা বয়সন্ধি রক্ষণশীলতা.....৬৫

※সূচিপত্র※

- ❖ সীমারেখা; মাহরম ও আন্তঃধর্ম বিবাহ.....৬৬
- ❖ যৌনতার পদ্ধতি.....৬৭
- ❖ বিধি নিষেধ সমূহ.....৬৮
- ❖ বংশবৃদ্ধি.....৬৯
- ❖ ইসলামি যৌন পরিছন্নতা বিষয়ক আইন শাস্ত্র.....৭০
- ❖ অবৈধ যৌনতা.....৭১
- ❖ হস্তমৈথুন.....৭২
- ❖ মুখমৈথুন.....৭৪
- ❖ ব্যভিচার ও পরকীয়া.....৭৪
- ❖ পতিতাবৃত্তি.....৭৫
- ❖ যিনা, ধর্ষণ, ইসলামে নারী.....৭৭
- ❖ পায়ূকাম, সমকামিতা.....৭৮
- ❖ অজাচার, পশুকাম.....৭৯
- ❖ পরকীয়া.....৮০
- ❖ তথ্যসূত্র.....৮৫

অন্ধকারে জ্বলে ওঠা জোনাকিরা

প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও গিয়েছিলাম বাজার-সওদা করতে। হঠাৎ কী হলো জানি না, একটা অপরিচিত কণ্ঠ বারবার ডেকে যাচ্ছে, "এই শোনেন না ভাই!" হতচকিত হয়ে তাকাতেই দৃষ্টিগোচর হয় এক মধ্যবয়সী নারী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে ডাকছে। তাঁর পাশ কাটিয়ে হনহন করে হেঁটে যেতে দেখি অজানা-অচেনা অসংখ্য মানুষকে। তারা মেয়েলি গন্ধ উপেক্ষা করে যে যার গন্তব্যে; সকলে শুনছে তার ডাকাডাকি, কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে বা আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না। আমি দূরে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে অবলোকন করতে থাকি তার কার্যকলাপ।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে দেখতে পেলাম, অল্প বয়সী একটা ছেলে তার সাথে আলাপচারিতায় মত্ত হয়ে আনন্দে ভাসছে। কৌতূহলবশত এগিয়ে গেলাম; সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেছি তাদের কাছে। আমাকে দেখে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় এবং বলতে থাকে, "কিছু প্রয়োজন? আপনার যদি প্রয়োজন হয় বলুন। আমাদের সাথে চলুন।" আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি দীর্ঘক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করছিলেন? এই ছেলেটিই-বা কে? আপনি একে নিয়ে কোথায় যেতে চান? আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এইখানে উৎকট দুর্গন্ধ। আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কীভাবে? আপনাদের তো শরীর খারাপ করবে। তার চেয়ে একটু ভালো জায়গায় যেয়ে তারপর আপনারা কথা বলুন। আর আপনার চাইতে অসমবয়সী ছেলেটার সাথে আপনার কী এত কথা যে আপনারা কথা বলতে বলতে আনন্দে হেসে কুটি কুটি হচ্ছেন?"

তখন মধ্যবয়সী ওই মেয়েটি আমাকে বলল, "আপনি বুঝবেন না দাদু, এতেই সুখ। আপনার লাগে, আপনি আমার সাথে আসতে পারেন।" আমি বললাম, "কী লাগবে, যা আপনি আমাকে দেবেন?" তখন সে আমাকে বলল, "আপনি চলুন আমার সাথে, এগিয়ে দেখবেন আপনাকে কী দিই।" তখন ছেলেটি আমাকে বলল, "দাদু আপনি যাবেন না, এখানে আপনার মতন মানুষ যায় না দাদু। এখানে যায় উঠতি বয়সের কিছু মানুষ। এইখান থেকে তারা মেয়েলি সুখ খুঁজতে থাকে।"

ঠিক তখনই আকাশের মুখ ভারী করে কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে গেল। বৃষ্টিতে ধুয়ে মিশে গেল এ প্রান্তর। দ্রুত পায়ে হেঁটে, বলা যায় দৌড়ে, দোচালা একটি দোকানে আশ্রয় নিলাম। আসার সময় বলে আসলাম, "হে দুষ্টু ললনা, তুমি করতে পারো কত ছলনা! তোমার মায়াবী ছলনায় ভুলিয়ে রাখো তুমি কত পৌরুষকে। মাতিয়ে রাখো তাদেরকে আদমখেলায় নিষিদ্ধ ও জঘন্য পাপকর্মে। তবে এটুকু বলে যাই যাবার বেলায়, যদি কখনো তোমার সাথে দেখা হয়, সেদিন শুনব তোমার কথা। কেন তুমি বেছে নিলে এই পথ? কেন তুমি ভাঙলে সোনালি শপথ? কেন তুমি বেছে নিলে দুর্গম আঁধারে মোড়ানো নিষ্ঠুর পথ? যেথা দেহটা হারিয়ে নিজেকে উপভোগের বস্তু বানিয়ে আজ তুমি বড়ই নিঃস্ব! তোমাকে পেয়ে মেতে ওঠে সারাবিশ্ব।"

বৃষ্টি থামার পর দ্রুত পায়ে হেঁটে এলাম, বাজার সওদা করে বাড়িতে একাকী ভাবতে থাকলাম—কেন মানুষ এমন হয়? কেন নিজেকে অকারণে বিলিয়ে দেয় ওই নোংরা পচা আবর্জনায়? সে কি কখনো ভাবে না, সেও তো মানুষ, তারও বাঁচার অধিকার আছে। কারণ এই জগৎ-সংসারের রং-রূপ-রস আস্বাদনের অধিকার আছে, মানবিক মূল্যবোধের অধিকার; তবে কেন সে নিজেকে গুটিয়ে নিল ওই নিষিদ্ধ অন্ধকার জগতে?

নিষিদ্ধ পল্লীর অভিজ্ঞতা

লোকমুখে শুনেছি নিষিদ্ধ পল্লীর কথা। সেখানে মানুষের আনাগোনা চলে দিনের চাইতে রাতের আঁধারে বেশি, আর যাতায়াত করে কুলি-মজুর থেকে শুরু করে ধনীর দুলালরাও। শরাব পান করে মিশে যায় নগ্নতার আদিম যুগে। এই শোনা কথাটি কেন জানি স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা জাগলো মনে। তাই তো একদিন পড়ন্ত বেলায় হাঁটি হাঁটি পা পা করে পৌঁছে গেলাম নিষিদ্ধ গলির কোলটায়। যেয়ে দেখি কত রংবেরঙের সাজ সেজে স্বল্পবসনে দাঁড়িয়ে আছে। অগণিত কপোতী, সকলেই খরিদ্দার ডাকছে—যে যার মতো ধরে নিয়ে যাচ্ছে গলির ভেতরে। কেউবা আলো-আঁধারির মাঝে দাঁড়িয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিচ্ছে দেদারসে। এ যেন এক নতুন জগৎ, নতুন অভিজ্ঞতা। যারা যাচ্ছে, নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে। গলির ওখানকার পরিবেশ খুবই নোংরা, আষ্টেপৃষ্টে পচা দুর্গন্ধ, তবুও মানুষগুলো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ধূমপান করছে। সে কী এক অভিনব পরিবেশ!

সামনের চায়ের দোকানে এক কর্ণারে বসে এক কাপ চা হাতে নিয়ে গরম উষ্ণ জলে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে থাকি, এরা কারা? এ কেমন পরিবেশ? এঁরা মানুষ নাকি অন্য কিছু! যেখানে বয়সের কোনো ভেদাভেদ নেই। একজন মায়ের বয়সী নারীকে নিয়ে যাচ্ছে অল্প বয়সের একটি ছেলে। আবার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকেও নিয়ে যাচ্ছে বাবার বয়সী একজন পুরুষ! হায়রে সমাজ! হায়রে আদিম উন্মত্ততা! যখন এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, তখন চায়ের দোকানদার বলতে থাকে, "ভাই চা গরম খাবেন না ঠান্ডা!" তার কথায় সংবিত ফিরে পেয়ে চা পান করতে শুরু করলাম।

এরই মাঝে অদূরেই হট্টগোল শুনতে পেলাম। উৎসুক জনতা দেখছে, শুনছে এক ব্যক্তির আহাজারি! সে চিৎকার করে বলছে, "আমার সব নিয়ে গেছে... আমার সব নিয়ে গেছে... ওরা আমাকে কিছুই দিল না।" ফিরে এই কথা বলতেই পাশ থেকে দুইজন লোক এসে তাকে বেদম প্রহার করলো। এমন কি পাশে থাকা ময়লা ভর্তি ড্রেনে ফেলে দিল। আর কয়েকজন এসে তাকে উদ্ধার করে গা ধোঁয়ায় তাড়িয়ে দিল। তখনও সে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, আর আবল-তাবল কথা বলতে থাকে। কিন্তু মক্ষীরানিদের সেদিকে একটুও খেয়াল নেই। কারণ ওরা চায় দেহের বিনিময়ে টাকা আর টাকা।

রুপা ও জবার করুণ কাহিনী

দীর্ঘ সময় ধরে চায়ের দোকানে বসে আলাপচারিতায় জানতে পারলাম। ওইখানে যারা আসে, অধিকাংশের পরিবার আছে। আবার পিতৃপরিচয়হীন সন্তান আছে অনেকের। সেখানে তারা খুঁজে নিয়েছে স্বর্গীয় সুখ; এমনকি এটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে, সহজলভ্য মনে করে, বিনা পরিশ্রমে উপার্জন করতে পারে বলে।
এর কিছুক্ষণ পরই একটা মহিলা আসলো চায়ের দোকানে। **ছদ্মনাম 'রুপা'।** সাংবাদিকের পরিচয়ে তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেলাম। তার সাথে কথোপকথনে জানতে পারি, তার বাসা বরিশাল। সে প্রতারিত হয়ে এখানে এসেছে। তাকে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। কাজ দেওয়ার কথা বলে এনে প্রথমে রাজি না থাকায় অনেক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সর্বশেষ তাকে বলা হলো, "তোকে কিনে নিয়েছি **ত্রিশ হাজার** টাকায়, তুই রাজি না হলে আমার টাকা দিয়ে চলে যা।" কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকায় শেষমেশ এই পথ বেছে নিয়েছি। রুপা আরও বলে— তার মতো অসংখ্য মেয়ে আছে যারা এই কাজ করতে করতে বুড়ি হয়ে গেছে। আবার অনেকে নিজের কাছে পাঁচ/দশটা করে মেয়ে রেখে কাজ করায়। নিজেরা করে না। এখানে স্বেচ্ছায় কেউই এসে এই কাজ করতে চায় না, বাধ্য হয়ে করে। এখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। আমাদের বাবা-মা সবাই আছে, কিন্তু আর কেউ নেই। সবাই মনোরঞ্জন করতে পারে, তবে যোগ্য সম্মান দিয়ে ঘরে তুলতে চায় না। বিভিন্ন উৎসবের সময় মন খারাপ থাকে, একাকী থাকার কারণে। তবুও কিছু করার নেই। অনেক খরিদ্দার টাকা না দিয়ে চলে যায়। কিছু বলতে গেলে মারধর খেতে হয়। আমরা শান্তিতে থাকতে পারি না। আর এখানে যারা আছে, তাদের প্রত্যেকের জীবনে সংঘটিত হয়েছে করুণ কাহিনী, যে গুলো বর্ণনা করা যায় না।

সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। ভাবলাম পরবর্তীতে আরও জানা যাবে। সময়স্বল্পতার কারণে হয়ে ওঠে না। হঠাৎ একদিন **ছদ্মনাম 'জবা'**, তার সাথে দেখা ও কথা বলে বুঝতে পারলাম যে, তাকে তার পরকিয়া প্রেমিক বিবাহ করবে বলে শহরে নিয়ে আসে। স্বামী-স্ত্রীর মতো কয়েকদিন সংসার জীবনযাপন করতে থাকে। একদিন বাজার করতে হবে বলে সাথে করে নিয়ে এসে, এক মাসিমার কাছে রেখে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। পরে জানতে পারি ওই মাসিমার কাছে আমাকে বেঁচে দিয়েছে **পঁচিশ হাজার** টাকায়। সেও ফিরে এলো না, আমারও আর ঘরে ফেরা হলো না। এখন শরীর বেঁচে জীবন চালাই। আমি এখানে যখন নতুন এসেছিলাম, তখন থেকে বাড়ি ফেরার খুব ইচ্ছে। হঠাৎ একদিন আমার বাবাকে দেখি ওই মাসিমার সাথে কথা বলতে। কী বলছে শুনতে পাচ্ছিলাম না। পরে দেখি যেই ঘরে আমি থাকি, আমার সেই ঘরে বাবা আসছেন। আর মাসিমা বলছে, "নতুন খরিদ্দার, ভালো করে আদর যত্ন করিস।" বাবা তখনও জানেন না, আমি তার মেয়ে জবা। আমার খাটে বাবা বসলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেন এসেছেন?" তখন তিনি বললেন, "আমার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মেয়েটা দেখতে তোমার মতো। তা তোমার নাম কি মা?"
আমি বললাম, "জবা।"

আমার বাবা বললেন, "যে ছেলেটা আমার মেয়েকে নষ্ট করে দিছে, তাকে আমি জেলে দিয়েছি। আজীবন জেলে থাকতে হবে। এখন আমার মেয়েকে পেলেই আমি খুশি!" বাবার কাছ থেকে মা-ভাইদের সকল খবর শুনে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলি, "বাবা, আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া জবা। ওই ছেলেটা আমাকে পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে।" আরও অনেক কথা হলো। বাবা আমাকে নিয়ে যাবেন বলে চলে গেলেন। গরিব মানুষ, আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন মাসি বললো—আমাকে নিয়ে যেতে হলে এক লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মা ঘরে তুলতে রাজি হয়নি। ভাইটা ছোট, সেও মায়ের ভয়ে কিছু বলতে পারে না। সেই কারণে এখানে থেকে যাওয়া। আমারও আর ঘরে ফেরা হলো না। তবে বছরে দুই/তিনবার বাবা আসেন দেখা করতে। এখানে না, সামনের চায়ের দোকানে বসে কথা বলে যান। কিছু জিনিসপত্র দিয়ে যান। এভাবে কষ্টের মধ্যে জীবন কাটছে আমার, ও এই নীল দুনিয়ার সব মেয়েদের।

শেষ প্রশ্ন ও ইতিহাস

এখন আপনি বলুন তো—এই পথে আমাদের কে বা কারা এনেছে? তারা সকলেই পুরুষ মানুষ। কারো ভাই, ছেলে, আপনজন, যাদের কথা শুনে আজ আমরা হয়ে গেছি নীল দুনিয়ার অধিবাসী, নীলকণ্ঠী। কেউ আমাদের বিক্রি করে টাকা নিয়ে যায়, আবার কেউ ভোগ করে টাকার বিনিময়ে। যারা আমাদের*পতিতা বা মক্ষীরানি বলেন, তাদের ভাবা উচিত—এসবের জন্য কারা দায়ী? আমরা জানি এটা খারাপ কাজ, কিন্তু এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কেউ চাইবে না আমাদের সাথে সংসার করতে। এখানে তো দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। বাইরে সে পথও বন্ধ। সেজন্য এখানে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। সেই কারণে আদিম ইতিহাস খুঁজতে শুরু করলাম।

এবার আসি পতিতাবৃত্তির ইতিহাস সম্পর্কে:

পতিতা, গণিকা, বারনারী, বেশ্যা যাই বলি—ঐ এক শ্রেণির নারীকেই বোঝায়। যারা টাকার বিনিময়ে নিজের দেহকে অন্যের হাতে তুলে দেয় পুরুষদের ভোগ-বিলাস, আনন্দ-ফূর্তির উদ্দেশ্যে। আমাদের সমাজ এদের ভালো চোখে দেখে না। সমাজের মানুষগুলো নিজের মনের ক্ষুধা মেটায়, তারপর এদের ফেলে দেয় ডাস্টবিনে। আবার যখন মনে ক্ষুধা লাগে, তখন সেই ডাস্টবিন থেকে তুলে চেটেপুটে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করে।

ডা. লুৎফর রহমানের একটি কথা—"এই সমাজে যদি তাদের (গণিকাদের) প্রয়োজন নাই থাকতো, তাহলে তারা অনেক আগেই হারিয়ে যেত।" এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। অপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস কখনো টিকে থাকে না। সমাজের আমি, আপনি বা আমরাই এই বৃত্তিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছি। জীবনভর আমার-আপনার প্রয়োজন মেটানোর পরেও সে আমার-আপনার চোখে খারাপ। গণিকাবৃত্তি নিয়ে এক নারী একটা কথা বলেছিল—"দেখ, যদি তোরা ফ্রিতে সব কিছু পাইতি, তাহলে আর খারাপ বলতি না, তখন সেবা দানকারী বলতি।" আমার কাছেও এই কথাটি যৌক্তিক মনে হয়েছে।

এইবার ইতিহাসের পালা..

বলা হয় সভ্যতার যে কয়টি পেশা আদিকাল থেকে চলে আসছে তার মধ্যে অন্যতম হলো পতিতাবৃত্তি। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই এই পেশা চলে আসছে। এই বার দেখা যাক কিভাবে এই পেশা আদিম পেশা এবং এর ইতিহাস কতটুকুই প্রাচীন..

প্রাগৈতিহাসিক যুগঃ

আমরা সবাই জানি প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ খাদ্য উৎপাদন না করে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই সময় মেয়েরা খাদ্য (ফলমূল) সংগ্রহ করত এবং পুরুষরা শিকার করত। এই শিকারের কাজে অনেক সময় পুরুষকে অনেক দূরে যেতে হতো... যাতে তাদের দুই-চার বা সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগত ফিরে আসতে। এই সময় পুরুষ হয়তো শিকার করতে করতে অণ্য একটি গোত্রের কাছে চলে যেত। এই সময় পুরুষের যদি কোন নারী সঙ্গ দরকার হতো তখন ঐ গোত্রের নারীর সাথে সে সঙ্গম করতে পারত। তবে এই সঙ্গমের বিনিময়ে তাকে শিকারের কিছু অংশ দিতে হতো। আর এর মাধ্যমেই দেহের বিনিময়ে অর্থেরে ধারণাটি প্রচলিত হয়। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এখন থেকেই পতিতা বৃত্তির শুরু।

তবে প্রাগৈতিহাসিক সময় কালের পতিতাবৃত্তি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেন প্রাগৈতিসাহিক কালে বিবাহ প্রথা ছিল না। এই সময় মানুষ যৌন স্বাধীনতা ভোগ করত। পরবর্তীতে বিবাহ প্রথা চালু হবার কারণে বিশেষ করে একপত্নী দ্বারা- যেদিন থেকে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের যৌন স্বাধীনতাকে খর্ব করে সেই দিন থেকেই এই ব্যবসার জন্ম হয় বলে অনেকেই মনে করেন।

ঐতিহাসিক যুগে গণিকাবৃত্তিঃ প্রাচীন ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম সহ সকল প্রাচীন সভ্যতায়ই এই বৃত্তি নানা ভাবে প্রচলিত ছিল।

ব্যাবিলনঃ

প্রাচীন ব্যাবিলনে পতিতাবৃত্তিকে পূন্যের কাজ মনে করা হতো। আর এই কারণে প্রত্যেক বাড়ি থেকেই প্রত্যেক নারীকে জীবনে অন্তত একবার টাকার বিনিময়ে দেহদান করতে হতো। ঐতিহাসিক হেরোডেটাস তার বর্ণনায় লিখেছেন - "মাইলিত্তা (ব্যাবিলনীয়দের রতিদেবী (Mylitta) দেবীর মন্দিরে প্রত্যেক নারীকেই অন্তত একবার যেতে হতো। তারা মন্দিরে লাইন ধরে বসে থাকত। এই মন্দিরে যে সকল পুরুষ আসত তারা নিজেদের পছন্দ মতো নারীকে রৌপ্যমুদ্রা নিক্ষেপ করত এবং বলত তোমার উপর মাইলিত্তার আর্শিবাদ বর্ষিত হোক। এই কথা বলার সাথে সাথে উক্ত নারী মুদ্রা নিক্ষেপকারী পুরুষের সাথে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে দেহ দান করত"। এই বিষয়টিকে ব্যাবিলনীয়রা ধর্মানুষ্ঠান মনে করত বলে কত টাকা দেয়া হলো সেটা বিচার করা হতো না। এখানে বিষয় হলো সুন্দর নারীরা খুব সহজেই নিজের খদ্দের পেয়ে যেত কিন্তু কুৎসিত নারীরা সহজে পেতনা। তাদের অনেক সময় দুই-তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। আর যতদিন পুরুষের সাথে মিলিত হতে না পরত ততদিন

ঘরে ফেরার নিয়ম ছিল না। হাম্বুবারীর আইনেই পতিতাদের কথা উল্লেখ আছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে এই আইনে।

ভারতবর্ষেঃ

প্রাচীন ভারতে পুরোহিতদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। এই সময়ের পুরোহিতরা অনেক সময় নিজেকে দেবতার সাথে তুলনা করতেন। পুরোহিতদের সম্পর্কে এমনও বলহয় যে- কোন নব-বিবাহিতা নারীর স্বামীর সাথে রাত কাটানোর পূর্বে পুরোহিতের সাথে রাত কাটাতে হতো। এছাড়াও পুরোহিতরা মনে করত-স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবতাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অপ্সরা, মেনেকা, রম্ভা অপ্সরাগণিকারা আছে, তাই পৃথিবীতে ও থাকা দরকার। আর এই ধারণা থেকেই বড় বড় মন্দির, তীর্থস্থানগুলোতে দেবদাসী রাখা হতো। পুরোহিতরা মনে করত - এরা দেবতার সেবা করবে, আর দেবতার কাছে সেবা পৌছে দেবার পথ হলো পুরোহিতকে সেবা করা। এই সকল দেবদাসীরা অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারী হতো। অনেক সময় এলাকার সুন্দরী নারীকে ধরে এনে দেবদাসী বানানো হতো। এই সকল দেবদাসীদের সাথে পুরোহিতদের অবৈধ যৌনক্রিয়া চলত। অনেক সময় পুরোহিতরা মন্দিরের অর্থ উপার্যনের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের সাথেও সঙ্গমের অনুমতি দিত।

কিভাবে দেবদাসী মন্দিরে আনা হতো তা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে-এটাও শোনা যায় যে- কোন কোন ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতা নিজকন্যাকে দেবতার সাথে বিয়ে দিয়ে তারা দাসী করে দিতেন। এই দেবদাসীরা দেবতার মূর্তির সামনে নৃত্য করত। এদের স্বতীত্ব রক্ষা করে চলতে হতো। যদি কোন কারণে চরিত্রে দোষ পাওয়া যেত তাহলে মন্দির থেকে বের করে দেয়া হতো। তবে স্বাভাবিক ত্বারণায় এবং পুরোহিতের লালসার (আর্থিক/ দৈহিক) কারণে এই স্বতিত্ব ধরে রাখা সম্ভব হতো না।

গ্রীসের পতিতাবৃত্তিঃ

গ্রীক দেবী ভেনাস ও আফ্রোদিতিকে পতিতাদের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই দুই জনের মূর্তি প্রকাশ্যে পূজা করা হতো। আর এই পূজার ব্যায় ভার বহন করা হতো মন্দিরের পতিতাদের আয়ের টাকা থেকে। প্রাতি মাসের চতুর্থ দিনে এই পূজা করা হতো। কোরিন্থ (Corinth) মন্দির হাজারের উপর পতিতা থাকত। কারণ বাবা-মা এই সকল নারীদের মন্দিরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন এবং পূন্য লাভের আশাই এই পতিতাবৃত্তি করত।

গ্রিক দার্শনিক ও আইনবিদ সলোন (Solon)। তিনি একবার আইন প্রনয়ন করেন যে পতিতারা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এদের আয়ের টাকা দিয়ে আফ্রোদিতির মন্দির নির্মান ও সংস্কার করা হবে। সলোনের সময় গ্রীসের নারীরা স্বেচ্ছায় মন্দিরে আসত না বিজিত অঞ্চলের সকল নারীকেই জোর করে মন্দিরে রাখা হতো পতিতাবৃত্তির জন্য। এরা রাষ্ট্রের সম্পদ ছিল বলে তাদের যদি কোন অসুখ বিসুখ হতো তাহলে কোন চিকিৎসা করা হতো না। দুই একজন পতিতা ছাড়া বাকি পতিতাদের জীবন ছিল খুব কষ্টের। খদ্দের কে আকৃষ্ট করার জন্য তারা রাস্তার পাশে নগ্ন হয়ে দাড়িয়ে থাকত। আবার অনেক সময় পথের পাশে তারা যৌনসঙ্গমও করত খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্য।

হেতায়ারা (Hetaira) নামে এক শ্রেণীর উঁচু দরের পতিতা ছিল গ্রিসে। এরা ছিল গ্রিসের কবি, দার্শনিক, সেনাপতি, রাজপুরুষের ভোগের সামগ্রী। যেহেতু এরা প্রভাবশালী মানুষের মনোবঞ্জন করত তাই তাদের শিক্ষিত ও শৈল্পিক মনের অধিকারী হতে হতো। এর বাসগৃহ বেশভূষা ছিল চাকচিক্যময়।

গ্রিক সভ্যতায় উপপত্নী প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রসংঙ্গ ডেমসথিনিসি (Demosthenese) বলেন " হেতায়রা আমাদের বিলাসিতার জন্য, উপপত্নীরূপে, প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য, স্ত্রী আইন স্বীকৃত পুত্র-কণ্যার জন্য। স্ত্রী অন্তঃপুরে অনুগত থেকে বৃদ্ধা হবে"। উপপত্নীর গর্ভে যদি কোন সন্তান জন্ম নিত তাহলে সে কোন নাগরিক বা সম্পত্তির অধিকার পেত না।

রোমেঃ

রোমের পতিতাদের অধিকাংশই ছিল বিজিত অঞ্চলের নারীরা। রোমান সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময় নারী-পুরুষ একত্রে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার প্রথা চালু হয়। এর ফলে সমগ্র ইতালি জুড়ে অনেক হাম্মামখানা চালু হয়। এই হাম্মামখানা গুলো হয়ে উঠে যৌনাচারনের কেন্দ্র। রোমে পতিতাবৃত্তি এতই প্রসার হয়েছিল যে-সাকার্স, থিয়েটার, মেলা, তীর্থস্থানগুলোতে গণিকাতে পরিপূর্ণ থাকত। তারা স্বাধীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারত এবং তাদের খদ্দের ধরতে পারত। দেশর সকলেই বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে হাম্মামখানা ও বারাঙ্গনা ভবনগুলোকেই বুঝত। এই সময় এই হাম্মামখানা ও বারাঙ্গানা ভবনগুলোতে অনেক বিবাহিত পুরুষ নিজের স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত। বড় বড় সম্রাট্রের স্ত্রীরাও নির্জন স্থান বাড়ি ভাড়া করে সম্রাটের অজ্ঞাতে পতিতাবৃত্তি করত। সম্রাট ক্লাডিয়াসের স্ত্রী মোনালিসা এই অপরাধে সম্রাটের আদেশে নিহত হন।

মধ্যযুগে ইউরোপের পতিতাবৃত্তিঃ

মধ্যযুগে (৫০০-১৫০০ খ্রিঃ) সময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই পতিতাবৃত্তির প্রসার লক্ষণীয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ শিল্পেউন্নত হয়। সৈন্যদলের উপভোগের জন্যও একদল ভ্রাম্যমান পতিতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। ক্রুসেডের সময় এই প্রথা গড়ে উঠলেও ক্রুসেড শেষ হওয়ার পরেও এই ব্যবসা চলতে থাকে।

ইংল্যান্ডেও অন্যান্য দেশের মতো পতিতা ব্যবসা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখানে রাষ্ট্রীয় কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের পতিতালয়সমূহ সরকারী স্নানাগারসমূহে কেন্দ্রীভূত হয়। এই সময় ১৫৪৬ সালে রাজা অষ্টম হেনরী আইন করে পতিতা ব্যবসা বন্ধ করেন । কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে পতিতারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ১৬৫০ সালে আইন করে আরো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেও গোপনে পতিতাবৃত্তি চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অধিবাসীদের সাথে ইংল্যান্ডের অধিবাসিদের মেলামেশার করাণে ফরাসী রীতিনীতি ইংল্যান্ডের ফ্যাশন হয়ে দাড়ায়। এবং ফরাসীদের অবাদ যৌনাচারণের প্রভাব ইংল্যান্ডেও পড়তে থাকে। লন্ডনের French Quarter এ পতিতাদের আড্ডা খানায় পরিণত হয়। এই সময় থিয়েটারগুলোতেও পতিতাদের আধিপত্য লক্ষ্যকরা যায়। এখানেও তারা যৌনব্যবসা

করত। এছাড়াও সমুদ্রবন্দরগুলোতেও পতিতাদের ভীড় লক্ষ্য করার মতো ছিল। এই সময় নাবিক ও সৈনিকদের মধ্যে যৌন জনিত রোগ ভয়াবহ আকারে দেখা দিলে ১৮৬২ সালে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি পতিতাদের হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য পরামর্শ দেয়। ১৮৬৪ সালে আইন করে পতিতাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

জাপানের পতিতাবৃত্তিঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত জাপানে গণিকাবৃত্তি অসংঘবদ্ধ ছিল। এই সময় পতিতারা এই এলকা থেকে অন্য এলকাতে ঘুড়ে বেড়াত। এই শতাব্দীতে পতিতা গুলোকে একত্রি করার চেষ্টা করা হয়। ইয়োডো অঞ্চলে অনেক পতিতাকে একত্রিত করা হয়। এবং এই সময় হতেই এই ব্যবসা লাভ জনক ব্যবসায় পরিণত হয়। ১৬১২ সালে একটা স্থায়ী কেন্দ্রের জন্য আবেদন করা হয় এবং ফুকিয়া মাচি এলাকাতে জঙ্গলাকীর্ণ একটি স্থান দেয়া হয়। পতিতারা এখানে অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে একটি সুন্দর শহর গড়ে তোলেন এবং এর নাম করণ করা হয় য়োশিওয়ারা। এর ৩০ বছর পর সরকার এই এলাকাটি খালি করার নিদের্শ দেন এবং পরবর্তীতে সরকার এই অঞ্চলের পাশেই আরেকটি জায়গা বরাদ্দ করেন পতিতাদের জন্য। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলেই তারা পতিতা ব্যবসা করে। জাপানের পতিতাদের একটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তারা ইচ্ছে করলেই সমাজে ফিরে যেতে পারত এবং সমাজও তাদের স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করত। এছাড়া যে সকল পতিতা সমাজে ফিরে আসত সরকার তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করত।

বাংলাদেশের পতিতবৃত্তিঃ

বাংলাদেশের পতিতালয়ের বিকাশ ঘটে মূলত ইংরেজদের সময় থেকেই। এই সময় ইংরেজ বণিকগন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাণিজ্য করতে যেত। এই সময় তারা তাদের মনো রঞ্জনের জন্য পতিতা সাথে রাখত। এছাড়া ঐসময় বাণিজ্যকেন্দ্র গুলোর আশে পাশে পতিতালয় গড়ে উঠে। বিশেষ করে নৌ-পথ বা সমুদ্র-পথের কাছা কাছি পতিতাপল্লী দেখা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কোন ভ্রাম্যমান পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ। তবে যদি কোন ভ্রাম্রমান পতিতাকে আটকানো হয় তাহলে তার শাস্তি হলো ৫০ টাকা জরিমান অথবা ৭ দিন কারাদন্ড। বাংলাদেশে মোটামুটি বৃহৎ পরিসরে পতিতালয় আছে ১৪টি। এই পতিতালয় গুলো বাণিজ্যিক অঞ্চলের আশেপাশেই অবস্থিত।

গণিকাবৃত্তি
আদিম ইতিহাস, বৈশিক কলা ও নীলকণ্ঠীদের আখ্যান

বেশ্যাগণের পুরুষগ্রহণ প্রবৃত্তি বা পুরুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অর্থার্জন সেই সৃষ্টিকাল থেকে চলে আসছে। এহেন কথাই বাৎস্যায়ন তাঁর বিরচিত "কামসূত্র" গ্রন্থের চতুর্থ অধিকরণে অবহিত করেছেন।"কামসূত্র", বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থে চতুর্থ অধিকরণটি বরাদ্দ করেছেন বৈশিকদের জন্য। বৈশিক কারা ? আসলে বেশ্যাদেরই "বৈশিক" বলা হয়। বেশ্যার অসংখ্য প্রতিপরিচয়, যেমনঃ- পতিতা, বারাঙ্গনা, দেহপসারিণী, দেহপোজীবিনী, রক্ষিতা, খানকি, বারবনিতা, উপপত্নী, জারিণী, সাধারণী, মহানগ্নী, পুংশ্চলী, পুংশ্চলূ, অতীত্বরী, বিজর্জরা, অসোগু, অতিষ্কদ্বরী, গণিকা এবং হাল আমলের যৌনকর্মীও বোঝায়। আদিম এবং প্রাগৈতিহাসিক নামও আছে। আরও তিনটি আধুনিক বিশেষণ : Pornstar, Call Girl, Escort Girl.
প্রসঙ্গত , বিশেষ এই পেশার মেয়েদের যে নাম বা যে বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে, সেগুলি সবই পেশার রকমফেরের উপর ভিত্তি করেই। সেহেতু গণিকা বা **নীলকণ্ঠী** এই শব্দটিই দেখব কীভাবে পাওয়া যায়।

ভিন্টারনিৎসের মতে ঋগবেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬তম সূক্তের অন্তর্গত পঞ্চম ঋকে যে "বিশ্যা" শব্দটি আছে তার থেকেই নাকি "বেশ্যা" কথাটির উৎপত্তি। ঋকটি হল : "সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐষন্ত পূজাঃ"। ভিন্টারনিৎস ঠিক না বেঠিক, সে ব্যাপারে এই ভারতের কোনো বেদবেত্তা পণ্ডিত কোনো আপত্তি করেছেন বলে জানা নেই।
গণিকা বা বেশ্যা বৃত্তির শুরুটা ঠিক কবে থেকে? গণিকাবৃত্তির প্রসঙ্গ উঠলেই সবাই বলে "আদিম পেশা"। "আদিম" মানে কী? আদিম জাতি বলতে আমরা সেই সময়ের মানুষের কথা বুঝি, যখন তারা পোশাকের ব্যবহার জানত না। গণিকাবৃত্তি ঠিক তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় সমাজে গণিকাবৃত্তি শুরু হয়েছে পোশাকের ব্যবহার জানার অনেক পর। নাগরিক-সভ্যতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণিকাবৃত্তির সূত্রপাত। নাগরিক জীবন শুরু হল বহির্দেশীয় মানুষদের অনুপ্রবেশ বা আগমনের পর, ভারতে যাঁরা "আর্য" পরিচিত। এই বহির্দেশীয়রাই ভূমিকন্যাদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করত। ধনশালী, বলশালী ও উচ্চস্তরের সাদাবর্ণের মানুষগুলো ভূমিকন্যা বা অনার্য কন্যাদের সঙ্গে শারিরীক লিপ্ত হলেও স্বীকৃতি দেয়নি। অনার্য-কন্যাদের সঙ্গে শোওয়া যায়, কিন্তু গ্রহণ করা যায় না।আর তাই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যত যুদ্ধের কাহিনি পাওয়া যায়, তার সবই আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কাহিনি। আর্যের জয়, অনার্যের পরাজয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের নামে আর্যদের দাদাগিরির কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে মনুসংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি তথাকথিত শাস্ত্রগুলিতে।

মনুসংহিতায় এইভাবেই পেয়ে যাই হাজারো জারজ সন্তান। আর্যরা ধর্ষণ করলে অনার্যদের শাস্তির বিধান ছিল। আর্যদের চাইতে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় আদি অনার্যদের সমরাস্ত্রের দিক থেকে কমজোরী ছিল। তারা আর্যদের মতো তির-ধনুক, বর্শা, ছোরা, কুঠার ব্যবহার করলেও আর্যদের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ ও কবচের ব্যবহার জানত না। তাই বারবার পরাজয় ঘটেছিল। অসুর, দৈত্য, রাক্ষস-খোক্ষস তকমা পেয়ে বহু সহস্র অনার্য পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। আর অনার্যদের অসহায় রমণীরা আর্যদের দাসী ও যৌনসঙ্গী বা রক্ষিতা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এদেরই একটা বড়ো অংশ যৌনজীবিকার পথ বেছে নিল। সেইসব রমণীরা বুঝল নারী-শরীরের প্রতি পুরুষদের লালসা তীব্র। অতএব এই শরীর মাগনা কেন, মূল্য দিতে হবে।

এরপর যখন সমাজে রাজতান্ত্রিকতার উন্মেষ ঘটেছিল, তখন এইসব রমণীদের শত্রু নিধন এবং গুপ্তচরবৃত্তির কাজে লাগানো হত। বিশিষ্ট্য অতিথি, অমাত্য এবং অপরাপর উচ্চধনীবর্গদের নারী-শরীর উপঢৌকন দিতে হত। বলা যায়, ঠিক এই সময় থেকেই গণিকাবৃত্তি রাষ্ট্রানুমোদিত হয়ে যায়। এই বৃত্তি তখন থেকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে পুষ্ট হতে থাকে।

অবশ্য প্রচলিত অর্থে বেশ্যা বা গণিকা বা পতিতা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন ভারতে এইসব রমণীরা তেমনটা ছিলেন না। স্বয়ং দেশের রাজা গণিকাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বার্ষিক ১০০০ পণ বেতন দিয়ে রাজা তাঁর প্রাসাদে গণিকাদের নিয়োগ করতেন। গণিকা বা বেশ্যাদের আয়ের একটা অংশ "কর" হিসাবে রাজার কোশাগারে সংগৃহীত হত। প্রাচীন ভারতে গণিকারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। তদুপরি গনিকদের ঘরে যেমন জ্ঞানী-গুণীদের আলোচনা-সভা বসত, আবার প্রাচীন ভারতেও এমন জ্ঞানী-গুণীদের এবং শিক্ষাব্রতীদের বেশ্যালয় ছিল প্রধান আখড়া। আরও জানা যায়, প্রাচীনকালে বেশ্যালয়ে বা গণিকালয়ে গমন খুব একটা গোপনীয় বা লজ্জাকর ছিল না। সেযুগের নাগরিকরা বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দিনে-দুপুরে গণিকালয়ে যাতায়াত করতেন।

প্রাচীনকালে বহুভোগ্যা নারীদের নানাবিধ নামে উল্লেখ করা হত গণিকাবৃত্তির চরিত্রানুসারে। তাই প্রত্যেকটি নামের মাহাত্ম্যও স্বতন্ত্র। যদিও মোটিভেশন একই, সকলেরই পেশা শরীর বিক্রি করা। প্রাচীনকালে "গণিকা" বলতে বোঝাত বহুভোগ্যা নারীকেই। গণ বা দলবদ্ধ হয়ে যে নারী যাপন করে তিনিই গণিকা। অনুরূপ "বেশ্যা" বলতে বোঝাত, যে নারী বেশ বা সাজসজ্জা দ্বারা পুরুষদের প্ররোচিত করে প্রলোভিত করে তাঁরাই বেশ্যা। আবার 'বেশ' শব্দের আদি অর্থ হল বাসস্থান, এই বিশেষ বাসস্থানে যে নারী বাস করেন তিনিই বেশ্যা। "পণ্যাঙ্গনা" বলা হত সেই নারীদের, যে নারীদের পণের বাজি রেখে সম্ভোগ করা হত।"বারস্ত্রী" তাঁরাই, যে নারীরা যুগপৎ মন্দিরের সেবাদাসী ও রাজা বা অমাত্য মর্যাদার রাজকর্মচারীদের ভোগ্যা হতেন। পরিচারিকা বা ক্রীতদাসী রক্ষিতারা হলেন "ভুজিয়া"। যে নারীর চরিত্রের পতন হয়েছে তিনি "পতিতা" ইত্যাদি। অনুমান করা হয়, প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের দৌলতেই 'পতিতা' শব্দটি বেশ্যার সুভাষণরূপে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ সালে লেখা 'বিচারক' গল্পে রবীন্দ্রনাথও দেখছি ব্যবহার করেছেন। সমর সেন 'গণিকা' শব্দটিই বেশি ব্যবহার করতেন।"প্রবাসী" পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর পত্রিকায় বারবার 'বেশ্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিককালে গণিকা বা বারবনিতাদের মতো "যৌনকর্মী" শব্দটিও একটি জীবিকাকে বর্ণনা করে।"যৌনকর্মী" শব্দটি যেন তাঁদের জীবিকাকে আরও বেশি করে চিহ্নিত করে।

বর্তমানে ধাত্রীবিদ্যা, উদ্যানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি যেমন নানা শিক্ষা আছে, ঠিক তেমনই সেকালে গণিকাবিদ্যাও ছিল এমনই এক শিক্ষণীয় বিষয় এবং সেই শিক্ষা এক্কেবারেই নিন্দনীয় ছিল না। এ বিষয়ে পৃথক বিদ্যালয়ও ছিল। রীতিমতো পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন দ্বারা আগামীদিনের গণিকাদের এইসব শিক্ষালয় থেকে উত্তীর্ণ হতে হত। নৃত্য-গীতবাদ্য ছাড়াও চিত্রকলা, জ্যোতিষশাস্ত্র, অভিনয়, রন্ধনবিদ্যা, ভাষাশিক্ষা, লিখন, মার্জিত ভাষায় কথা বলা, মালাগাঁথা ইত্যাদি এরকম ৬৪ কলায় পারদর্শী করে তোলা হত। ৬৪ কলায় সুশিক্ষিতা, রূপবতী, গুণবতী বেশ্যা বা গণিকারাই জনসমাজে মর্যাদাপ্রাপ্ত হতেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞা অনুযায়ী, গণিকাবৃত্তি হল স্বামী বা বন্ধুকে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে নগদ অর্থ বা অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে বাছবিচারহীনভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া। তসলিমা নাসরিন এই পেশা সম্বন্ধে বলেন, "এটাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা বলে লোককে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা হয় বটে, আসলে এটা কিন্তু প্রাচীনতম পেশা নয়, এটা বরং মেয়েদের বিরুদ্ধে 'পৃথিবীর প্রাচীনতম নির্যাতন'"। এই পণ্য-দুনিয়ায় নারী-মানুষকে পণ্য করার নেটওয়ার্কগুলির জোয়ার প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। আর এই সুনামির মূল প্রতিপাদ্য যৌন-বাণিজ্য ও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মুনাফা। বাৎসায়নের "কামসূত্র"-এ বৈশিকাখ্যং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "রুচি হইতে যে পুরুষগ্রহণপ্রবৃত্তি তা স্বাভাবিক আর অর্থার্জনার্থ যে প্রবৃত্তি তা কৃত্রিম"। বাৎসায়ন উল্লিখিত "অর্থার্জনার্থ" এই কৃত্রিম প্রবৃত্তিই নিন্দার্হ্য। এই গণিকাবৃত্তিই বর্তমান বিশ্বে এক নম্বরের বাণিজ্য-উপজীব্য, অনেক দেশের রাজকোশের অর্থের গণিকাবৃত্তিই প্রধান উৎস। কৌটিল্য বিভিন্ন কারণে যৌনব্যাবসাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অবৈধ নারীসংসর্গ বোঝাতে তিনি 'বাহ্যবিহার' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই 'বাহ্যবিহার'-এর পক্ষে বা বিপক্ষে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি কৌটিল্য। বাৎসায়ন বলেছেন, গণিকা অথবা বিধবাদের সঙ্গে দেহসম্ভোগ সমর্থন করা হয় না, আবার নিষিদ্ধও নয়। সমাজবিদ লেকির মতে, গণিকাবৃত্তি হল সমাজের মাত্রাতিরিক্ত যৌনকামনা বেরিয়ে যাওয়ার একটি সেফটি-ভালভ। লেকি মনে করেন, নিজে মূর্তিমতী পাপীষ্ঠা হলেও পরিণামে পুণ্যের অধিকারিণী এই গণিকা। এরা না-থাকলে সংখ্যাহীন সুখী পরিবারের প্রশ্নাতীত পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেত। তাহলে কি চিরটাকাল সমাজের বিষ-ক্লেদ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠী হয়ে থেকে যাবে গণিকাশ্রেণি! নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন একটি ব্লগে লিখতে গিয়ে বলেছেন "ক্রীতদাসপ্রথার সঙ্গে পতিতা প্রথার মূলত কোনো পার্থক্য নেই। ক্রীতদাসরা যখন তুলো ক্ষেতে চাষের কাজ করত, দাসমালিকরা প্রায়ই সশরীরে উপস্থিত হয়ে কিছু ক্রীতদাসীকে যৌনকর্মের জন্য তুলে নিয়ে যেত। ত্বক যাদের একটু কম কালো, সাধারণত তাদেরকেই পছন্দ করত। বাজারে নিয়ে যৌন-ব্যাবসার জন্য ভাড়া খাটাত, নয়তো সরাসরি পতিতালয়েই তাদের নগদ টাকায় বিক্রি করে দিত। আঠারো-উনিশ শতকে যে প্রথাটিকে বলা হত ক্রীতদাস প্রথা, বিংশ-একবিংশ শতকে সেই প্রথাকে বলা হচ্ছে পতিতা প্রথা"।

অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বিক্রির ইতিহাস সুপ্রাচীন। ওয়েবস্টার অভিধান মতে, সুমেরিয়ানদের মধ্যেই প্রথম পবিত্র পতিতার দেখা মেলে। প্রাচীন গ্রন্থাদিসূত্রে, যেমন ইতিহাসের জনক হিসাবে খ্যাত হিরোডেটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০/২০) এর লেখায় এই পবিত্র গণিকাবৃত্তির প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেটি প্রথম শুরু হয়েছিল ব্যাবিলনে। সেখানে প্রত্যেক নারীকে বছরে অন্তত একবার করে যৌনতা, উর্বরতা ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে যেতে হত এবং সেবাশুশ্রূষার নমুনা হিসাবে নামমাত্র মূল্যে যৌনসঙ্গম করতে হত একজন বিদেশির সঙ্গে। এরকমই গণিকাবৃত্তির চর্চা হত সাইপ্রাস এবং করিন্থেও। এটি বিস্তৃত হয়েছিল সার্দিনিয়া এবং কিছু ফিনিশীয় সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে ইস্টার দেবতার সম্মানে। ফিনিশীয়দের মাধ্যমে ক্রমশ এটি ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য বন্দর শহরগুলিতেও সংক্রমিত হয়, যেমন সিসিলি, ক্রটন, রোসানো ভাগলিও, সিক্কা ভেনেরিয়া এবং অন্যান্য শহরে। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় এশিয়া মাইনর, লাইদিয়া, সিরিয়া ও এট্রাকসনের প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজে বেশ্যা বা পতিতারা ছিলেন স্বাধীন এবং তাঁরা বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করা ও কর দেওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিল।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" থেকে পতিতা ও পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত ভারতবর্ষীয় চিত্র পাওয়া যায়। কী বলছে অর্থশাস্ত্র? অর্থশাস্ত্র বলছে দেহব্যাবসা একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথা। পুরোপুরি ঘৃণিত বা গোপনীয় নয়। কৌটিল্যের সময় দেহব্যাবসা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয় বলে জানা যায়, যে শিল্পের নাম ছিল বৈশিক কলা। বিশেষজ্ঞরা এ শিল্পের চর্চা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়ে গণিকাধ্যক্ষেরও উল্লেখ আছে। এখানে মৌর্য সামাজ্যের সময়কার বহু পুরুষগামী বারাঙ্গনা নারীদের হাল-হকিকৎ প্রাসঙ্গিক একটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গণিকাধ্যক্ষের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গণিকাদের সংগঠিত ও দেখভাল করা। গণিকাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করতেন দেশের রাজা। গণিকাধ্যক্ষের আর-একটা প্রধান কাজ ছিল গণিকাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখা। কোন্ গণিকার দিনে কত খরিদ্দার আসছে, খরিদ্দার-পিছু পারিশ্রমিক কত, উপরি পাওনা কী এবং কত, তার ব্যয়ই-বা কত–সে সবকিছুই জাবেদা খাতায় নথিভুক্ত করত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কোনো গণিকা যদি তাঁর বৃত্তি ছেড়ে চলে যায় অথবা কোনো কারণে মারা যায়, তাহলে তাঁর মেয়ে বা বোন তাঁর বৃত্তি গ্রহণ করবে। এই কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তিরও সে মালিক হবে। অথবা সেই মৃতা কিংবা বৃত্তিত্যাজ্যা গণিকার মা তাঁর শূন্যস্থান অন্য কোনো যোগ্য মেয়ে দ্বারা পূরণ করতে পারবে।যদি সেই মৃতা কিংবা বৃত্তিত্যাজ্যা গণিকার মেয়ে বা বোন বা মাতৃনিযুক্ত প্রতিগণিকা না-থাকে সেক্ষেত্রে তাঁর ত্যাজ্য ধন রাজকোশে জমা পড়বে।

কৌটিল্যের সময়ে গণিকাদের তিনভাগে ভাগ করা হত। যেমন–কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কোন্ গুণাবলি বিবেচনা করে এই বিভাজন? বিভাজন হত কোন্ গণিকার কীরকম রূপ, কীরকম শারীরিক গঠন, কীরকম বয়স–সব মিলিয়ে তাঁর পুরুষ আকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের ক্ষমতা কতোখানি এসব দেখে তাকে উত্তম, মধ্যম বা কনিষ্ঠ শ্রেণির গণিকার স্বীকৃত দেওয়া হত। এই স্বীকৃত বা সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল একমাত্র গণিকাধ্যক্ষের।